Dr. Milton Biswas
Professor
Bangla Department
Jagannath University Dhaka.

মানসী

নীহাররঞ্জন রায়

"কড়ি ও কোমলে"ও কবি স্ব-প্রতিষ্ঠ হইতে পারেন নাই, তাঁহার কাব্য এখনও সত্য ও সার্থক সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ছন্দের উপর যথেচ্ছ অধিকার এখনও জন্মায় নাই। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় লাভ ঘটিল "মানসী'তে। "মানসী"তেই তিনি সর্বপ্রথম নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হইলেন, এবং তাহার প্রদীপ্ত কবিপ্রতিভার প্রথম উন্মেষ লক্ষ্য করা গেল। কি প্রেম, কি নিসর্গ, সব কিছু সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তাহা এই সময় হইতেই একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিল, তিনি মানস—সুন্দরীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। "মানসী"র নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি তাহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সুতীব্র অনুভূতি, সুগভীর ভাবগাম্ভীর্য এবং অপূর্ব ছন্দসম্পদে সমৃদ্ধ। 'সিন্ধুতরঙ্গ' 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় যে ভাবও ধ্বনি গাম্ভীর্য, চিন্তার যে গভীরতা, মনের যে উন্মুক্ত প্রসার এবং যে সবল কল্পনার ঐশ্বর্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্ববর্তী কোনও কবিতাতেই দেখা যায় না এবং পরবর্তী কালে *'সোনার তরী" "চিত্রা", "চৈতালী", "কল্পনা"* ও *"পূরবী"তে* এই গুণগুলিই বিচিত্র ওক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শব্দ নির্বাচনের ক্ষমতা, ধ্বনি ও ছন্দকে হাতের ক্রীড়নক করিয়া নিজের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, কথার তুলিতে ছবি আঁকিবার ক্ষমতা সমস্তই *'মানসীর'র* অধিকাংশ কবিতায় অপূর্ব নৈপুণ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; *'কুহুধ্বনি', 'বধূ'* অপেক্ষা *একাল ও সেকাল* প্রভৃতি কবিতা তাহার প্রমাণ। তাহা ছাড়া এই জাতীয় কবিতায় কবি হৃদয়ের সে সুগভীর, সহানুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ প্রথম লক্ষ্য করা যায় তাহাই পরবর্তী জীবনে আরও ব্যাপক, আরও সমৃদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে অপরূপ সম্পদ দান করিয়াছে। বস্তুত, "মানসীই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্যসৃষ্টি; এবং এই কাব্যেই উত্তর-জীবনের রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবপ্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুগুলি ধরা পড়িয়াছে।

"মানসী"র কবিতাগুলি ১২৯৪ বৈশাখ হইতে ১২৯৭ কার্তিকের মধ্যে লেখা এবং অধিকাংশ কবিতাই গাজিপুরের নির্জনবাসে রচিত। প্রথম কবিতা 'উপহার' ১২১৭ বৈশাখের রচনা, কিন্তু এই কবিতাটিতেই "মানসী"র এবং পরবর্তী কবি-জীবনের মর্মবাণীটি ব্যক্ত হইয়াছে—

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।

এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা। (উপসংহার)

বিশ্ব-জীবনের তরঙ্গাঘাত প্রতিমুহূর্তে কবিচিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, এবং তাহার ফলে যে বিচিত্র অনুভূতি জন্মলাভ করিতেছে, কবি তাহাকেই বাণীরূপ দান করিতেছেন—ইহাই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ইতিহাস। এই বাণীরূপই তাহার মানসী-প্রতিমা। অনন্ত কাল ও অনন্ত বিশ্ব-জীবন রবীন্দ্র-কবিচিত্তের পটভূমি; তাহার কবিমানস খন্ড বস্তুকে খন্ড জীবনকে লইয়া সৃষ্টি সূচনা করে, কিন্তু মুহূর্তেই তাহা ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অনন্তকালের মধ্যে, বিশ্বজীবনের অসীমতার মধ্যে—

জগতের মর্ম হতে মোর মর্ম স্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী। ('জীবন মধ্যাহ্ন')

অথবা,

বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন—কুহরে
মঙ্গল আনন্দ ধ্বনি বাজে। ('জীবন—মধ্যাহ্ন')

ঠিক এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ কবিতায় যে উদার নিখিল ব্যাপ্তি, যে সুগভীর গাম্ভীর্য, যে সর্বানুভূতি ও বিশ্ববোধ লক্ষ্য করা যায়, এবং তাহার ফলে এই জাতীয় কবিতাগুলি যে রূপ ও রস-সমৃদ্ধি লাভ করে তাহা কবির প্রেমের কবিতায় অথবা দেশ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় না। *"মানসী"*তে এই তিন জাতীয় কবিতাই আছে, কিন্তু রসিক পাঠক তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, নিসর্গ কবিতাগুলির সঙ্গে অন্য জাতীয় কবিতাগুলির রসসমৃদ্ধির তুলনাই হইতে পারে না। পরবর্তী কবিজীবনে এই কথার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। *"মানসী"*র প্রেমের কবিতাগুলিতে এবং পরবর্তী জীবনের প্রেমের কবিতায়ও প্রেমের বিচিত্র লীলারহস্যের পরিচয় যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু যেহেতু সেই প্রেম কায়া-নৈকট্য হারাইয়া, বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, সেই হেতুই এই প্রেমের রসনিবিড়তা ক্ষুণ্ন হয়, তাহার ঘন মাধুর্য নিসর্গ সৌরভের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। মানবচিত্ত তাহাতে রসাবেশে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রেমস্পদকে পাইবার অথবা ভোগ করিবার আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উছে না, ভাবলোকের আসঙ্গ লিপ্সারই প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে। ঠিক এই কারণেই, কীটস অথবা চন্ডীদাসকে আমরা যে হিসাবে প্রেমের কবি বলি, রবীন্দ্রনাথকে সেই হিসাবে প্রেমের কবি বলিতে পারি না। অথচ যে দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রবীন্দ্রানাথের প্রেমের কবিতা রসনিবিড় হইয়া উঠতে পারে না, সেই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তাঁহার নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি অপরূপ রসঘন মূর্তি লাভ করে। এই জাতীয় কবিতাগুলিতে যে মুহূর্তে বিশ্বের নিঃশ্বাস আসিয়া লাগে সেই মুহূর্তেই কবিতাগুলি অপূর্ব অনির্বচনীয় রূপলোকে রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

এই নিসর্গ কথাটি কোনও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, শুধু প্রকৃতি বুজিতেছি না। মানুষ, পৃথিবী, মানবজীবন, বিশ্বজীবন, সৌন্দর্য সমস্তই এই নিসর্গের অন্তর্গত এবং ব্যাপক অর্থে প্রেমও। কিন্তু প্রেমের কবিতা বলিতে এখানে যাহা বুঝিতেছি তাহা শুধু আমাদের জড় জগতের নরনারীর দেহ-আত্মাকে লইয়া যে লীলা তাহাই বুঝিতেছি, এবং সেই অর্থেই শুধু রবীন্দ্রানাথের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে উপরের কথাগুলি প্রযোজ্য।

এই দেহ-আত্মাকে লইয়া প্রেমলীলার খুব গভীর,পরিচয় যে "মানসী"র কবিতাগুলিতে আছে, এমন কথা বলা যায় না। *'ভুলভাঙ্গা' 'বিরহানল' 'বিচ্ছেদের শান্তি, 'ক্ষণিক মিলন,*

সংশয়ের আবেগ, নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, গুপ্তপ্রেম, ব্যক্তপ্রেম, নিস্ফল প্রয়াস, সুরদাসের প্রার্থনা বা *আখির অপরাধ, হৃদয়ের গান, পূর্বকালে, অনন্ত প্রেম* প্রভৃতি এই প্রেমলীলার সহজ অথচ বিচিত্র অনুভূতির পরিচয় কবিচিত্তের তরঙ্গিত ভাবধারায় রূপান্তরিত হইয়া অপূর্ব গীতমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ *'নিষ্ফল কামনা'* এবং এই কবিতাটির মধ্যেই কবিচিত্তের রোম্যান্টিক ভাবকল্পনা যেন দানা বাঁধিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা

বৃথা এ ক্রন্দন।
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কি দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম,
পারিবি মিটাতে জীবনের অনন্ত অভাব?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে, অতি সঙ্গোপনে
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে,
শত ঋতু আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান
ভালবাসো প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।

আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই। ('নিস্ফল কামনা')

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, নরনারীর দেহ—আত্মার লীলা সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা,ইহাই তাহার দৃষ্টিভঙ্গি। ভোগবাসনা মানুষের মনে মোহ উৎপন্ন করে, মোহ হইতে জাগে বিভ্রম, এই বিভ্রম মানবের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ম্লান করিয়া দেয়, বৃহতের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করে। কাজেই নিবাও বাসনা-বহ্নি। প্রেম অনন্ত, নরবারীর দেহ-আত্মার লীলার মধ্যে তাহার খন্ড অংশ মাত্র প্রকাশ পায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে ডুবিয়া গেলে প্রেমের সমগ্রতা উপলব্ধি করা যায় না। এই খন্ড-প্রেম হইতে মুক্তি চাই, বাসনার আবেগ এবং মুক্তির কামনা এই দুইয়ের হর্ষে ও ব্যথায় কবিচিত্ত আন্দোলিত। অনন্ত প্রেম চাই, সেই প্রেমকে পাইতে হইলে নরনারীরদেহ-আত্মার লীলার শুধু সৌরভটুকু আহরণ কর, সৌন্দর্য -বিকাশটুকু দেখ, মধুটুকু পান কর, কিন্তু প্রেমাস্পদকে একান্ত করিয়া চাহিও না। খন্ড প্রেমে তৃপ্তি পাইবে না, পাওয়ার জন্য ক্রন্দন বৃথা, 'বৃথা' এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা' জীবনের অনন্ত অভাব আমাদের এই খন্ড প্রেম দ্বারা মিটান যায় না। এই কথাই, এই দৃষ্টিভঙ্গিই মানসীর কবিতাগুলিতে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। *"কড়ি ও কোমলে"* এই দৃষ্টিভঙ্গির আভাস আমরা পাইয়াছি, মানসীতে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল। অজিতবাবু সত্যই বলিয়াছেন,

"মানসীর প্রেমের কবিতাগুলিতে যদিও জীবনের খুব গভীরতায় পরিচয় আছে তথাপি সে প্রেম যে জীবনের সব নয়, তাহাকে যে চরম করিয়া তোলা চলে না, এমন একটি ভাব মানসীর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বারংবার প্রকাশ পাইয়াছে।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী, "রবীন্দ্রনাথ")

যে-দুইটি নরনারীর প্রেম চিরদিবসের অনন্ত প্রেমের মধ্যে অবসান লাভ করে, যে প্রেমের মধ্যে 'সকল প্রেমের স্মৃতি, সকল কালের সকল কবির গীতি' আসিয়া আশ্রয় লয়, যে প্রেমের মধ্যে আসিয়া মেশে নিখিলের সুখ, নিখিলের দুঃখ, নিখিলের প্রাণের প্রীতি, সেই দেহ-আত্মার প্রেম কতটা নিবিড়তা হারাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী?

স্বদেশ এবং আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের অনুভূতি হইতেও "মানসী"র কয়েকটি কবিতা জন্মলাভ করিয়াছে। *'দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর, গুরু গোবিন্দ, নব বঙ্গ—দম্পতির প্রেমালাপ, ধর্ম-প্রচার* প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এ পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। এই ধরনের কবিতা "কড়ি ও কোমলেও কিছু কিছু কখনও আকর্ষণ করিতে পারে নাই, আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের মিথ্যা আড়ম্বর, কাপুরুষতা, চিত্তের দৈন্য, ভিক্ষার প্রভৃত্তি, মূঢ় নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতিও তিনি কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই-নানা প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, বক্তৃতায় তিনি সর্বদা তাহা অকুণ্ঠচিত্তে ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক সময় দেশবাসী তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু কবি যাহা অনুভব করিয়াছেন, নির্ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। সমসাময়িক কাব্য-রচনায়ও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু মানসীতে দেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সম্বন্ধে কবির গভীর দরদ ও সহানুভূতি এখনও

সার্থক রচনা ও সুদূর-প্রসারী দৃষ্টির মধ্যে আসন লাভ করিতে পারে নাই; এখনও শুধু তিনি লঘু বিদ্রুপ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়াই আমাদের স্বদেশবাসীর ক্ষুদ্রতা নীচতা ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তবু দুরন্ত আশার মধ্যে একটা সত্য ও গভীর অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবিতাটির মধ্যে একটা দুঃখ-বরণের আকাঙ্খা, দুঃসাধ্য ব্রত-উদযাপনের আনন্দ বৃহত্তর জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার একটা দুর্দম বাসনা, একটা সুস্থ সবল উন্মুখ অসভ্য জীবন-যাপন করিবার ইচ্ছা কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১২৯২, ৩১-এ জ্যৈষ্ঠের লেখা একটি পত্রেও এই ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে ("ছিন্নপত্র," বিশ্বভারতী, ১৩৭ পৃঃ)।

"মানসী"র নিসর্গ কবিতাগুলির মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিতে হইল, কারণ, এই কবিতাগুলির ভিতরই রবীন্দ্রানাথের কবিমানস সত্য ও সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই কবিতাগুলিতে ছন্দ ও ধ্বনি-সম্পদ, শব্দ চয়ন নৈপুণ্য, এবং কথায় তুলিতে ছবি আঁকার ক্ষমতার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। রসিক পাঠক যাঁহারা "একাল ও সেকাল" মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন, কবি যেন এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন যুগের নিসর্গমণিকোঠার রহস্য—কৃষ্ণিকাটির সন্ধান আমাদের দিয়াছেন, কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি চন্ডীদাস, রামায়ণ—মহাভারতের জগৎযেন মন্ত্রবলে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে নূতন রসে ও ভাবে অভিষিক্ত হইয়া।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী ('একাল ও সেকাল')

অথবা,

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষার। ('বর্ষার দিনে')

অথবা,

"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল"— ('বধূ')

অথবা,

প্রখর মধ্যাহ্ন—তাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল—শ্বসনা। ('কুহুধ্বনি')

অথবা,

সকাল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়। ('অপেক্ষা')

অথবা,

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চল মাঝে, ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে। ('ভালো করে বলে যাও')

অথবা, অকুল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ('বিদায়')

প্রভৃতি কবিতায় যে শান্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য, যে করুণ কোমল সুকুমার শ্রী, নিসর্গের যে অনির্বচনীয় রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের অতুলনীয় সম্পদ, ইহাই রবীন্দ্র-কবিতার মূল ঐশ্বর্য।

কিন্তু নিসর্গের শান্ত মধুর কান্ত রূপ রচনাতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই; তাহার রুদ্র রূপ, মমতাহীন, নিষ্ঠুর রূপও কবিচিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে, এবং পরবর্তী জীবনে নিসর্গের এই দিকটার যে পরিচয় *"বলাকা"* অথবা *"পূরবী"*তে দেখা যায়, তাহার প্রথম আভাস মানসীর *'নিষ্ঠুর সৃষ্টি, 'প্রকৃতির প্রতি, সিন্ধুতরঙ্গ* প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যাইতেছে। মানসীর এই জাতীয় কবিতাগুলিতেও কবির অদ্ভুত শব্দচিত্র রচনার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; সিন্ধুতরঙ্গ কবিতাটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

"মানসীতে দেখিতেছি, নরনারীর দেহ আত্মার লীলা, নিসর্গের বিচিত্র সৌন্দর্যমাধুর্য, স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবন সব কিছুই কবিচিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু সব কিছুর ভিতরেই যেন কবিচিত্ত একটু ব্যথায় বেদনায় ভারাক্রান্ত। প্রেমাস্পদের হৃদয় যে শুধু দেহের মধ্যে কোথায় যেন একটু বেদনাবোধ আছে; স্বদেশ সমাজ ও জাতীয় জীবনের যে সমস্ত ত্রুটি ও দৈন্যকে তিনি বিদ্রুপ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও একটু বেদনাবোধ প্রচ্ছন্ন আছে বই কি। নিসর্গ কবিতাগুলির মধ্যেও তাহা বাদ পড়ে নাই।

শুধু এই বেদনাবোধ নয়, যাহা কিছু তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলা, নিসর্গের কান্ত মধুর প্রেম, সবকিছু হইতে মুক্তি পাইবার একটা আকুলতা 'মানসী'র কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়। একটা বৃহত্তর জীবনের মধ্যে দুঃখবরণের জন্য, একটা দুর্দম উন্মুক্ত জীবনের জন্য ব্যাকুলতা 'দুরন্ত আশা' কবিতাটিতে সুস্পষ্ট, ইহা আগেই বলিয়াছি। যে প্রেম জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা' বলিবার জন্য ব্যাকুল, সেই প্রেমও যেন কবিকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যময় কাব্যময় জীবনের মধ্যে কবি আর আনন্দ পাইতেছে না, এই সংকীর্ণ রুদ্ধ জীবন যেন তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে। এই ধরনের বস্তুহীন ভাব-কল্পনার জীবনে কবি অতৃপ্ত, এবং এই অতৃপ্তি অনেক কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সব চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে ভৈরবী গান কবিতাটিতে। বৃহত্তর জীবনের প্রখর দহন, নিষ্ঠুর আঘাত, পাষাণ কঠিন পথ তিনি কামনা করিতেছেন-অশ্রুসজল ভৈরবী গান আর তাঁহার ভালা লাগিতেছে না।

ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণ কঠিন স্মরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে। ('ভৈরবী গান')

(রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা)

মানসীতে প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

'মানসী'তে রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভার পূর্ণ উদয় সংঘটিত হইয়াছে। এখন হইতে তাঁহার কবি-কর্ম প্রকৃত শিল্পমর্যাদা লাভ করিয়াছে—তাহার প্রকৃত কবি-শিল্পীর জীবন আরম্ভ হইয়াছে। আত্মশক্তিতে তিনি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন এবং সার্থক ও ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দ প্রয়োগে এবং মনোমত ছন্দে তাঁহার ভাব ও কল্পনাকে রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'মানসী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্য—সৃষ্টি।

কবি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

'পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমল-এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পূর্বেই যুক্ত-অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তে ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছি। কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।' -(রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খন্ড, ভূমিকা)

এই বিশ্বের অবারিত শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তাঁহার হৃদয়-বেলায় অবিরাম তরঙ্গাঘাত করিতেছে। এই আঘাতে তাঁহার প্রাণে বিচিত্র অনুভূতি ও ভাব জাগিতেছে। সেই অনুভূতি ও ভাব যে বাণীরূপে গ্রহণ করিতেছে, তাহাই তাঁহার মানসী। বিশ্ব তাঁহার অন্দরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অন্তরের ভাবে ও রূপে রূপায়িত হইয়া তাহার কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভিতর ও বাহিরের মিলন হইয়াছে। এই ভিতর ও বাহিরের ব্যাকুলিত মিলন-মুহূর্তেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ আনন্দমুহূর্ত -এই মিলনকে রূপায়িত করাতেই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার এখন কাজ,—

এ চির- জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

অসীম বিশ্ব তাঁহার কবি-চিত্ত স্পর্শ করিতেছে তাঁহার কবি-চিত্তও সেই বিশ্বের সব খণ্ড সৌন্দর্যের রূপ দান করিয়া সীমা দ্বারা অসীমকে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। এইভাবেই কবি অসীমের সীমারচনা করিয়া মানসী প্রতিমা গড়িয়া তুলিতেছেন। এইরূপেই চলিয়াছে কবির সৃষ্টি-প্রবাহ। বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের লীলাই তাঁহার কবি-মানসের চিরন্তন সৃষ্টি-রহস্য।

'কড়ি ও কোমল' কবি মানবজীবনের তীরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইলেন। তরুণ চোখে নারী অপরূপ সৌন্দর্যে প্রতিভাত হইল। সেই নারী সৌন্দর্য ও প্রেমের জয়গানে *'কড়ি ও কোমল'* মুখর। 'মানসী'তে সেই প্রেম বিভিন্ন ছন্দে ও রূপে উৎসারিত হইয়াছে। কবির মানস-প্রিয়ার প্রতি তাহার প্রেম -নিবেদন ও প্রেমের সংশয়-সুখ-দুঃখ-হর্ষ-বিষাদময় বিচিত্র লীলাই 'মানসী'র প্রধান বিষয়বস্তু। প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কবি চিরন্তন সৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেমের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কামনার সংকীর্ণতা ও ক্ষণিকতা হইতে সৌন্দর্য ও প্রেমকে মুক্ত করিয়া একটি অপার্থিব ভাবস্তরে উন্নীত করিবার জন্য একটা বেদনাময় ব্যাকুলতাই 'মানসী'র মূল সুর।

'কড়ি ও কোমল'-এর নারীর রূপ বর্ণনামূলক কবিতাগুচ্ছের মধ্যেই নারী-সৌন্দর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। 'মানসী'তে প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। 'মানসী'কে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্য বলা হয়।

সৌন্দর্যের উপলব্ধি হইতেছে রূপের রমণীয়তার অনির্বচনীয় উৎকর্ষবোধ ও সেই রমণীর রূপের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হইতেছে প্রেম। সৌন্দর্য ও তাহার উপর আকর্ষণ প্রেমের মধ্যে আমাদের intellect ও emotion বুদ্ধি ও অনুভব সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। সৌন্দর্যের উপলব্ধি একটা নৈর্ব্যক্তিক মানস-ক্রিয়া বটে, কিন্তু সৌন্দর্যের আধারের প্রতি আকর্ষণ ও মোহ হৃদয়-রাজত্বের সীমানায়, সুতরাং সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমানুভূতির সূত্রপাত হয়, —এই আবেগই রস। যাহা মুগ্ধ করে, যাহা হৃদয়কে অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত করে, তাহার প্রতি একটা অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হওয়া, সৌন্দর্যের আধার দেহকে কামনা করা, তাহার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। নারীর সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে প্রেমানুভূতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং প্রেমের মনস্তত্ত্বসম্মত পরিণতির জন্য দেহ একান্ত প্রয়োজন। দেহই সৌন্দর্যের বাস্তব বিগ্রহ এবং দেহের চারিপাশ ঘিরিয়া হৃদয়ের কামনা-বাসনার বিচিত্র রাগিণী গুঞ্জন করিয়া থাকে। প্রেম-মনস্তত্ত্বের ইহা একটি স্বীকৃত সত্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-কল্পনা ভিনস্তরের। বাস্তব জগৎ ও জীবনকে তাহাদের নিজস্ব রূপ ও রসে গ্রহণ না করিয়া, তাহাদের মধ্যে কবির মনোগত এক আদর্শ সৌন্দর্য আরোপ করিয়া, ঐ জগৎ ও জীবন যতটুকু তাহার মানস—সৌন্দর্যের অনুগত, তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়া, তাহা হইতে এক অপার্থিব সৌন্দর্যধ্যানের ভাবজগৎ সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এই অতীন্দ্রিয় মনোবিলাস বা ভাববিলাসমূলক যে সৌন্দর্যবোধ, জগৎ ও জীবনকে তাহারই অধীন করিয়া তাহা হইতে এক অপার্থিব রসের উৎসারণই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান সুর।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-চেতনা বিশেষভাবে নারীরূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'কড়ি ও কোমল'-এ কবি নারীর দেহ-সৌন্দর্যের যে উদাত্ত স্তোত্রপাঠ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেহ-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা বা বাস্তব রূপতন্ময়তার উল্লাস নাই। এই রূপের মধ্যে যে এক অপার্থিব সৌন্দর্য আছে, কবির দৃষ্টি তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। স্থূলকে অবলম্বন করিয়াই তিনি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়ের কামনা করিয়াছেন, দেহসীমাতেই দে অতীত সুন্দরকে ধরিবার প্রয়াস করিয়াছেন। এই অপার্থিব রূপের তৃষ্ণা, এই সৌন্দর্যকাঙ্ক্ষা, এই ভাবময় সৌন্দর্য-সাধনা হইতে তাঁহার প্রেমানুভূতির উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং এই প্রেমেও এক অতি-সূক্ষ্ম মানসিক পিপাসা-এক ভাবময় আকুতি। এই প্রেম দেহসম্বন্ধ বিচ্যুত, নর-নারীর বাস্তব ভোগাকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে এক অনির্বনীয় আনন্দরস।

মানসী কাব্যে এই প্রেমের স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে-প্রেম বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে দেহের চারিপাশে ঘুরিয়া মরে, ব্যক্তি-মানুষের বাস্তব দেহ-মন যাহার ভিত্তি, সেই আবেগময়, আত্মহারা, সাধারণ মানুষের প্রেম রবীন্দ্রনাথের প্রেম নয়। মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত প্রেমের রূপটি সম্পূর্ণভাবে উদঘাটিত হইয়াছে। প্রেম অসীম, অনন্তের ধন, আত্মার সম্পদ, দেহের সীমায় তাহাকে ধরা যায় না। প্রেমপাত্রী নারীর নয়ন

হইতে 'আত্মার রহস্যশিখা'র বিচ্ছুরণ দেখা যায়। সেই 'অমৃত', সেই স্বর্গের অসীম রহস্যকে কবি দেহের মধ্যে খুঁজিয়া না পাইয়া অতৃপ্ত আকাঙ্খার বেদনায় অস্থির হইতেছেন। সেই অসীম অনির্বচনীয় প্রেম-ধনের অধিকারী যে নারী, তাহাকে তো দেহের মধ্যে পাওয়া যায় না, তা কবি 'সমগ্র মানব'কে পাইতে চাওয়া দুঃসাহস বলিয়া মনে করিতেছেন। 'ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নহে যে মানব'-অনির্বচনীয় সৌন্দর্য বিকাশ করিয়া প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিশ্বের আনন্দবর্ধনের আর ভগবানের মহিমা প্রচারের জন্য, তাহাকে নিজের ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিতে 'বাসনা-ছুরি' দিয়া কাটিয়া উঠাইয়া লওয়া কি সম্ভব? তাই কবি বলিতেছেন,—

লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসা, প্রেমে হও বলী—
চেয়োনা তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

সুতরাং 'নিভাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে'। প্রেম দেহসম্বন্ধ বিরহিত, অপার্থিব সৌন্দর্যের নিবিড় অনুভূতি-এক অনির্বচনীয় আনন্দরস। এই রসে সিঞ্চিত করিয়া বিমুগ্ধ শিল্পীর মতো তিনি প্রেমকে আস্বাদন করিয়াছেন। কবির মানসী দেহ সম্বন্ধের উর্ধ্বগতি এক চিরন্তন সৌন্দর্যময়ী নারী-যাহার অধিষ্ঠান তাহার চিত্তলোকে, যাহাকে তিনি মানবীর মধ্যে পাইবার জন্য বারবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ ও হতাশ হইয়াছেন। 'মানসী'তে পূর্ণ যুবক কবির মধ্যে বাস্তব রূপ-রসের অতিপ্রবল আকর্ষণ এবং বাস্তবাতীত সৌন্দর্য-প্রেমের জন্য তীব্র আকাঙ্খা-এই দুয়ের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বাস্তব কামনা-বাসনার সংকীর্ণতা হইতে প্রেমকে মুক্ত করিবার জন্য একটা বেদনাময় ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে 'মানসী'র মধ্যে। এই 'সুখ-দুঃখ-বিরহ মিলনপূর্ণ ভালোবাসা' ও 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' উভয়েই সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে পরবর্তী গ্রন্থ 'সোনার তরী'ও 'চিত্রা'য়। বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা ও ধ্যান মানসী অপেক্ষা বহুল পরিমাণে গভীরতর, ব্যাপকতর ও বৈচিত্র্যমন্ডিত হইয়াছে এ দুই গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেম-কল্পনায় দেহের উর্ধ্বচারী বলিয়া তাহার প্রেমকবিতা মিলনের আবেগ-উত্তেজনা-চাঞ্চল্য প্রকাশ অপেক্ষা স্থির ও স্নিগ্ধ-মধুর জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। বিরহে তাহার মানসী প্রতিমাকে বিশ্বব্যাপিনী করিয়া কবি তাহার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের সমস্ত আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং হৃদয়ের বহু-বিচিত্র প্রেমানুভূতির অর্ঘ নেই অপ্রত্যক্ষ হৃদয়বাসিনীকে প্রদান করিয়াছেন। বিরহেই কবির প্রেমানুভূতির চরম আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। দেহধর্মের দ্বারা আবদ্ধ প্রেম সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, বাস্তব কামনার দ্বারা পঙ্কিল; দেহসম্বন্ধ যেখানে নাই, সেখানেই প্রেমের মুক্তি, প্রেমের সর্বজনীনত্ব, প্রেমের দেশকাল পাত্রনিরপেক্ষ সর্বজনীন রূপ। এই প্রেম অনন্তের সামগ্রী এবং বিরহেই তাহার স্ফূর্তি। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পরিভাষায় রবীন্দ্রনাথ বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গারের কবি।

'মানসী'র পর রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের আর এক রূপ দেখি 'মহুয়া'য় প্রেমের অনুভূতি কবি-চিত্তের স্বভাবজাত বৃত্তি। চিত্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অনুভূতি নানারূপে পরিবর্তিত হয়। প্রথম যৌবনের প্রেমানুভূতি ও প্রেমের কল্পনা পূর্ণ-যৌবনে বদলায়, যৌবনের অনুভূতি প্রৌঢ়ত্ব, প্রৌঢ়ত্বের অনুভূতি বার্ধক্যে বদলায়। এই বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকিলেও, রূপ হয় বিভিন্ন। মহুয়ার প্রেমানুভূতি, রবীন্দ্র-সোনার তরী-চিত্রা বা ক্ষণিকার অনুভূতি নয়, 'পূরবী'র অনুভূতিও নয়। রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম চিরকালই দেহ-মনের আকাঙ্ক্ষা-কামনার উর্ধ্বে একটা ভাবময় প্রেরণা—যৌনাকর্ষণ-বর্জিত, দেহমন -নিরপেক্ষ একটা ভাব-সাধনা মাত্র। তাঁহার প্রেম-কবিতায় উৎকৃষ্ট কাব্য, সঙ্গীত ও ব্যঞ্জনার অপরূপ লীলা থাকিলেও দেহ-সৌন্দর্যের যে নিবিড় আকর্ষণ প্রাণের সমস্ত তন্ত্রীকে ঝংকার তুলিয়া উন্মত্ত রাগিণীর সৃষ্টি করে, 'প্রতি অঙ্গ তরে প্রতি অঙ্গ কাঁদে, যে-চরম কামনা দেহকেই স্বর্গ বলিয়া মনে করে ও এই জড় দেহকেই চিরন্তনত্ব দান করে, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাকুন, তবু হিয়া জুড়ন না গেল' বলিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, যে আকাঙ্খা দেহ ও মনকে ঘিরিয়াই তাহার সার্থকতার স্বপ্ন রচনা করে, দেহ ও মনের সমস্ত লীলা ও অভিব্যক্তির মধ্যে পায় চরম আনন্দ ও রহস্যের সন্ধ্যান, সেই নর-নারীর পরস্পর আকর্ষণ, কামনা-আকাঙ্ক্ষার সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত মনোহর প্রকাশ তাহাতেই নাই। ইহা 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত প্রেম-কবিতায় লক্ষ্য করা গিয়াছে।

বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক ও নানা তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাব-চিন্তার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া আসিয়া কবি আবার যে-প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে প্রেমের একটা ভিন্নরূপ আমরা দেখিতে পাই। এই প্রেমে কিছু বাস্তবতার স্পর্শ থাকিলেও ইহা দেহমনের উর্ধ্বস্তরের; ইহা প্রেমের অন্তর্নিহিত স্বরূপ, মানব জীবনে প্রেমের প্রভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা -প্রেমের জয়ঘোষণা। ইহা জীবনাশ্রয়ী প্রেমের তত্ত্ব ও দর্শনের অপূর্ব কাব্যরূপ।

'মহুয়া'য় প্রেমের ভাব-কল্পনার নূতন রূপ হইতেছে—কবি প্রেমকে দেখিয়াছেন এক মহাশক্তিরূপে। এই প্রেম অমিতবীর্যশালী, বলিষ্ঠ পৌরুষের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এবং ত্যাগ ও তপস্যার হোমাগ্নিপূত। জীবনপথে এই প্রেম সমস্ত বাধা-বিপত্তিতে পদদলিত করে, প্রেমিক-প্রেমিকাকে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইবার শক্তি দান করে। এই যুগল-প্রেম-প্রেমিকাকে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইবার শক্তি দান করে। এই যুগল প্রেম বাস্তবজীবনের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধযুক্ত, রূঢ় জীবনবোধে উদ্দীপ্ত, সংগ্রামশীল এবং পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় আলোক-বর্তিকা। এই প্রেমবন্ধন নয়, চলার পথের একমাত্র পাথেয়। নারী আত্মার সঙ্গিনী—বিলাসের নর্মসহচরী নয়। মহুয়ায় প্রেমিক প্রেমিকাকে বলিতেছে—

পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে...
উড়াব উর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্গম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই-তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।

এই প্রেম আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করিয়া বিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। ইহা আধ্যাত্মদীপ্তিমন্ডিত, বিশ্বের প্রাণধারার সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ যে চিরযৌবন, তাহারই উদাত্ত বাণী।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ-বেদনার দ্বারা পরিশুদ্ধ, ত্যাগ-তপস্যাকর্ষিত, কেবলমাত্র জৈবপ্রেরণার গন্ডিতে অনাবদ্ধ, সংসারের নর-নারীর এই প্রেমকে অতি-উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি কালিদাসের *'কুমারসম্ভব'* ও *'শকুন্তলা'*র মধ্যে এই প্রেমের রূপ দেখিয়াছেন। ইহাই কালিদাসের প্রেমাদর্শ। প্রেম কেবল আদিম প্রবৃত্তির প্রেরণা নয়, দেহগত রূপের প্রতি আকর্ষণ নয়, ইহা দুঃখের তপস্যার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক, এক মঙ্গলময়, কল্যাণময় সত্যের অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ তাহার এই প্রেম কল্পনায় ভোগতান্ত্রিকতাকে বর্জন করিয়াছেন, দেহকেই একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই, দেহ ও আত্মার,সীমা ও অসীমের বাস্তব ও আদর্শের মিলন-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কবি নর-নারীর এই কল্যাণময় প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নারীর প্রেমে পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করিতে পারে, কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যার নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো, এই দুয়ের যৌগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর এক সুরও বাজতে পারে মদনধনুর জ্যায়ের টংকার-সে মুক্তি সুর না, বন্ধনের সঙ্গীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।'—(পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি)।

রবীন্দ্রনাথ সুরুচি, সংযম ও শালীনতার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। দেহ-লালসা সাহিত্যে সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া বীভৎস আকার ধারণ করিতে পারে বলিয়া তাহার আশঙ্কা ছিল। সেজন্যও কবি প্রেমে দেহ-সান্নিধ্য কামনা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাহার নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—

সাহিত্যে লালসা জিনিসটা অত্যন্ত সস্তা-ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মন্ত্রেই সহসসাধ্য। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সঞ্চার অতি অল্পেই হয়।..... মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে-সব সংস্কার, জীবন-সৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরানো-প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে না ছুঁতেই তারা ঝন্‌ঝনে করে বেজে ওঠে। 'মেঘনাদবধের নরক বর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষ্যে মাইকেল এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন করে উদগীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে-এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিশক্তির প্রয়োজন করে না,-কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে-সব ঘৃণ্যতার মূল তারপ্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে স্থান পাবে না, একথা বলবো না, কিন্তু সেটা যদি একান্তই দৈহিক সস্তা জিনিস হয়, তাহলে আকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।'—(সাহিত্যের পথে)

কল্লোল যুগের লেখকেরা আধুনিক রিয়ালিজিমের নামে দেহ-ভোগের যে চূড়ান্ত অশ্লীল চিত্র আঁকিতেছিল, সে সম্বন্ধেও কবি সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন—

'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রুতা আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে, রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিকার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙটা-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিকে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবীর নেই গুলাল নেই, পিচকারী নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চীৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই বসন্ত-উৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলি নে। অতএব সাইক্যোনোলিসিসে এর কার্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে উৎসবের মুল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এক্ষেত্রে অসঙ্গত বলেই আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।'

—(সাহিত্যের পথে)

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের আলোচনার রবীন্দ্রনাথের এই দেহে-বিতৃষ্ণা তাঁহার জীবদ্দশাতেই কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই দেহাহীত ও অতিন্দ্রীয় প্রেমের বিরুদ্ধে মোহিতলাল মজুমদার তাহার কবি-কণ্ঠের স্পষ্ট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। মোহিতলাল বলিলেন, দেহ ছাড়া আত্মার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, দেহদ্বারাই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। মোহিতলালের এই দেহাত্মবাদ কিন্তু নাস্তিকের অনাত্মবাদ নয়। কবির মতে আত্মা অমৃত বটে, কিন্তু তাহা এই দেহভান্ডারে প্রতি অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া এবং পূর্ণ করিয়া আছে।—

দেহের মাঝে আত্মা রাজে—ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ;
আত্মা-দেহ ভিন্ন কেহ হয় যে কভু-এক সমান!
তাই ত তোমার দেহের সীমায় ধরতে পারি অসীমেরে—
দুই—এর ক্ষুধা একের সুধা কেবল ত সেই পরম—ক্ষণে!

এই দেহাত্মবাদ প্রেমকে বাস্তব জীবনের মধ্যে, নর-নারীর দেহ-মিলনের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত করিয়াছে। জীবনের সমস্ত আনন্দ দেহকেই কেন্দ্র করিয়া বিকশিত এবং দেহ-মিলনের মধ্যেই প্রেম পৃথিবীকে অমৃতময় করিয়া তোলে, জীবনের বৃহত্তর সত্যের অভ্যাস দেয়। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনেও মানুষের অবাধ আনন্দের অধিকার আছে। মানবজীবনের মত-সহস্র দুঃখ -জ্বালা সত্ত্বেও কবি মোক্ষ কামনা করেন না-পুনর্জন্ম নিরাধ করিতে চাহেন না; বার বার সংসারে ঘুরিয়া আসিয়া এই জীবনের নব নব রূপ ও রস-নব নব আনন্দ-বেদনা উপভোগ করিতে চাহেন :

জীবনের সুখ-দুঃখ বারবার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো।
যাতনার হাহারবে গান গাই,—তৃষ্ণার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো'!
তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো।

এই বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও সুস্থ দেহকামনা মোহিতলালের কাব্যে ক্লাসিক্যাল প্রকাশভঙ্গির সংযম ও ভাস্কর্যরীতির দৃঢ় সংহতির সঙ্গে প্রকাশলাভ করিয়াছে।

মোহিতলালের দেহবাদে যে-সংযম, যে-মননশীলতা ও সৌন্দর্যবোধ ছিল, পরবর্তীকালে কল্লোলযুগ-প্রভাবিত বুদ্ধদেব বসুর প্রেম-কবিতায় তাহার অভাব দেখা যায়। রোমান্টিক প্রেমকে উভয় কবিই প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতায় দেহ-কামনার উগ্রতা এবং বিরংসার আবেগময় রূপটি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ কবি ডি. এইচ লরেন্সের প্রভাব বুদ্ধদেবের উপর বেশি। বুদ্ধদেবের অনেক প্রেম-কবিতায় লরেন্সের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাহার কবিতায় দেহ-কামনার এই আবেগময় উচ্ছাস, লরেন্সের অনুপ্রেরণা বলিয়া মনে হয়।

বুদ্ধদেব প্রেমের দেহাতীত রূপ কল্পনা করিতে পারেন না। 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী' যে-মানুষ, দেহগত পীড়নে যে উদ্‌ভ্রান্ত, তাহার কাছে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-প্রেমের কোনো অর্থ নাই :

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি,—

'আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশনে' কবি বিপর্যস্ত তাহার কাছে যৌবন আমার অভিশাপ। যৌবন দেহকে অস্বীকার করিতে পারে না, দেহসঞ্জাত কামনা—বাসনাকেও লুপ্ত করিতে পারে না। কবি মানুষের এই সহজাত দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—আসঙ্গ-বাসনা পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক'। বুদ্ধদেবের মধ্যে যৌন-কামনার তাড়না, আদিম প্রবৃত্তির এই দুর্দমনীয় আবেগের সঙ্গে ডি. এইচ. লরেন্সের এই কবিতাটি তুলনীয়—

But then came another hunger
Very deep,and ravening;
The very body's body crying out
With a hunger more frightening, more profound
Than stomach or throst even the mind;
Roedder than death, more clamorous,
The hunger for the woman. Alas!
It is so deep a Moloch ruthless and strong,
Tis like the untterable name of the dread Lord.
Not to be spoken aloud.

Yet there it is, the hunger which comes upon us,
Which we must learn to satisfy with pure, real satisfaction;
Or perish, there is no alternative.

মোহিতলালের মতো বুদ্ধদেবও এই দেহের মধ্যেই অমৃতকে আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন, দেহকে অবলম্বন করিয়াই দেহাতীতের সন্ধান করিয়াছেন :

.... এই দেহ-ধূপ দহি উঠিয়াছে কামনার ধূম,-
তাহারি সুগন্ধে মোর স্নায়ুতন্ত্রী শিহরিত! সেই মোর কলঙ্ক—কুঙ্কুম।
পবিত্র বলিয়া এই নরদেহে করেছি স্বীকার
দেহস্পর্শে উচ্ছ্বসিছে অমৃত আত্মার;

লরেন্সের ঐ কবিতাটির মধ্যেও এইরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

Immortality, the heaven, is only a projection of this strange
but actual fulfilment
here in the flesh.

(১) প্রিয়ার সহিত কবির নিবিড় মিলন হইয়াছিল। একদিন উভয়েরই দেহ ও মনে উভয়ের জন্য অসীম প্রেম ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহাদের জগৎ ছিল সুন্দর, জীবন ছিল মধুর। কিন্তু সে প্রেম এখন বিস্মৃতপ্রায়-উভয়ের মধ্যে আজ একটা ব্যবধান রচিত হইয়াছে। তবুও সে প্রেমের স্মৃতির আজ মন হইতে লুপ্ত হয় নাই। তাহার—

শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি,
লাজে বাধ্যে-বাধ্যে সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উচ্ছ্বাস
নয়ন-কুলে। —(ভুলে)

এই প্রিয়া-শূন্য জীবন বড় বেদনাদায়ক-সঙ্গীহীন জীবন দুর্বিষহ। তিনি ভাবিতেছেন,—

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি?
দেখিনে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথী!

তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাহাদের প্রেম হইবে চিরস্থায়ী-জীবন চিরদিনের মতো অফুরন্ত সুধায় ভরিয়া উঠিবে। কিন্তু যে উন্মাদনা, যে আবেগ, যে মাদকতা জীবনকে গ্রাস করিয়াছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে—কেবল স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট আছে। তিনি বলিতেছেন,—

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর!
মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।—(ভুল ভাঙা)

প্রেমের সর্বজয়ী আহ্বানে প্রিয়ার সহিত তিনি মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মিলনে তিনি যেই সুলভ ও সাধারণ হইয়া গেলেন, অমনি প্রেমের অনির্বচনীয়ত্ব ও মাধুর্য কর্পূরের মতো উবিয়া গেল—

এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।
রহিয়াছে, এখন—
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কবি সেই লোক—দেখানো, প্রাণহীন আদরের দ্বারা নিজেকে ও তাঁহার প্রিয়াকে অপমান করিতে চাহেন না, তাই বিদায় লইলেন। কবি তাহার মানস-প্রিয়ার সহিত ক্ষণ—মিলনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সে প্রিয়া—

একদা এলোচুলে কোন তুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারিদিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া। —(ক্ষণিক মিলন)

তারপর বিরহে কবি প্রিয়ার ধ্যানে আত্মাহারা হইয়াছিলেন—

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে-ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গনি কাননে। —(বিরহানন্দ)

তখন ছিল—'ত্রিভুবনমণি তন্ময়ং বিরহে।' কবি বিরহের স্বপ্নলোকে প্রিয়ার মূর্তি রচনা করিয়া পূজা করিতেছিলেন। কিন্তু সংসারে বাস্তব-প্রিয়ার সম্মুখীন হইয়া তাহার স্বপ্ন রূঢ়ভাবে ভাঙিয়া গেল :

বিরহ সুমধুর হলো দূর কেন রে?
মিলন দাবানলে গেল জ্ব'লে যেন রে।
কই সে দেবী কই, হেরো ওই একাকার,—
শ্মশান-বিলাসনী বিবাসিনী বিহরে।

হৃদয় হইতে প্রেম নিঃশেষ হইল। মানস-প্রিয়ার স্বপ্নমূর্তি ভাঙিয়া গেল। কবির হৃদয় বিরাগ—ভরা বিবেকে পূর্ণ। এই শূন্য হৃদয়ে আবার প্রেমের আকাঙ্খা জাগিয়াছে। প্রেমই যে কবিচিত্তের সঞ্জবনী শক্তি। কবি প্রেমের সেই মধুর উন্মাদনা আবার অনুভব করিতে চাহিতেছেন,

আবার প্রাণে নুতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল-স্রোতে
বহায় যদি।
আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে নিবে কে?
আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে?
(শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা)

কবি জোর করিয়া প্রেম ও প্রিয়াকে হৃদয় হইতে নির্বাসন দিলেও, তিনি যে তাদের ভুলিতে পারিতেছেন না। তাহার মানস-প্রিয়া সারা বিশ্ব জুড়িয়া আছে। তিনি দূরে থাকেন না যতই ভুলিতে চেষ্টা করুন, হৃদয়-অন্তঃপুরে তাহার মানসীর আসন-চরিতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি যাহা বুঝিতে পারিয়া অকপটে তাহার হৃদয়ের দুর্বলতা স্বীকার করিতেছেন—

তবে লুকাবো না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিযা লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার। —(আত্মসমর্পণ)

কবি আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার প্রেম ব্যক্ত করিলেন বটে, কিন্তু যৌবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনার সিন্ধু মথিত করিয়া যে মানসী কবি-চিত্তে আবির্ভূতা হইয়াছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কবি-হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রেমধারা উৎসারিত হইতেছে, তাহাকে তিনি পরিপূর্ণরূপে পাইতেছেন না। প্রণয়িনীর দ্বারা তাহার সৌন্দর্যক্ষুধা, প্রেম-ক্ষুধা কিছুতেই মিটিতেছে না। কবি প্রিয়ার মধ্যে তাহার আকাঙ্খিত সৌন্দর্য ও প্রেমের মূর্তিবতী মানসীকে পাইতেছে না। তাই তাহার ব্যাকুল অন্বেষণ—

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি নয়নে
খুঁজিতেছে, কোথা তুমি,
কোথা তৃমি।
যে অমৃত লুকানো তোমার
সে কোথায়।
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।
—(নিষ্ফল কামনা)

কবি প্রণয়িনীর দেহের মধ্যে তাহাকে খুজিয়া পাইতেছে না—তাই তাহার নয়নে বিচ্ছুরিত আত্মার রহস্য-শিখার আলোকে তাহাকে সম্পূর্ণ চিনিতে চাহিতেছেন। সৌন্দর্য ও প্রেম-উভয়েই অনন্ত, অসীম। খন্ডিত করিয়া নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া পাইতে হইলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। প্রেমিক অনন্ত প্রেমের নিকট জীবনের উৎসর্গ করে ও

প্রেমিকাকে অনন্ত বলিয়া অনুভব করে। প্রেমিকার অনন্ত সত্তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না—

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর
কী পারবি দিতে।

সেই অনন্ত জীবনকে পাইতে হইলে অনন্ত প্রেম আবশ্যক—মানুষের অনন্ত অভাব মিটাইতে হইলে অনন্ত প্রেমের প্রয়োজন।

আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?

কিন্তু মানুষ নিজেই বদ্ধ, দুর্বল, অন্ধ-নিজের দুঃখ-বেদনা-অভাবের ভারে জর্জরিত—সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে।

মানুষের ভোগ-লালসা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। সৌন্দর্য ও প্রেমের ভোগতৃপ্তির জন্য নারী সৃষ্ট হয় নাই।

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সঙ্গোপনে,
সুখে, দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে, মরণে,
শত ঋতু -আবর্তনে,
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি।
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাহ ছিঁড়ে নিতে?
—(নিষ্ফল কামনা)

যখন সমগ্রকে পাওয়া যাইতেছে না, তখন প্রেমাস্পদের মধ্যে যে অসীম সৌন্দর্য ও প্রেমের আভাসটুকু পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট তাকা উচিত। তাহাদের একান্ত করিয়া উপভোগের যে আত্মসুখসর্বস্ব বাসনা, তাহাকে বিসর্জন দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
...
নিবাও বাসনা—বহ্নি নয়নের নীরে। —(নিষ্ফল কামনা)

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে *'নিষ্ফল কামনা'* কবিতাটির একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহার মধ্যে নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাব-চিন্তার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। এমন করিয়া দেহের সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করিয়া আত্মার মহিমা ঘোষণা করা এবং প্রেমকে ব্যক্তি-সম্পর্ক বিবর্জিত এক অনায়ত্ত আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া নির্বিশেষে আনন্দরস পানের সামগ্রীতে পরিণত করার দৃষ্টান্তও এই প্রেম-তত্ত্বের সদম্ভ ঘোষণা রবীন্দ্রকাব্যের আর কোথাও দেখা যায় না।

দেহের দাবী ও জীবনের বাস্তবক্ষুধাকে অস্বীকার করিয়া, মানুষের স্বাভাবিক রূপতৃষ্ণা ও প্রেমোৎকণ্ঠাকে উপেক্ষা করিয়া কবি প্রেমকে অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করায় এই প্রেম সূক্ষ্ম মানস-ক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধির বস্তু হইয়া পড়িয়াছে, এবং হৃদয়ের আবেগ-উদ্দীপনা, হর্ষ-বিষাদের উত্থান-পতনের অনুভূতির গভীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই কবিতাটিতে কবি প্রেমে দেহসম্বন্ধের ব্যর্থতা সম্বন্ধে যুক্তি ও তত্ত্বের অবতারণা করিয়া উপদেশছলে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

মানুষের আত্মা অনন্ত ও অসীম, দেহাবদ্ধ হইলেও দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। দেহের মধ্য হইতে সেই আত্মার জ্যোতি অপরূপ সৌন্দর্যরূপে বিকীর্ণ নয়। কামনা-বাসনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সেই অনন্তের ধনকে ভোগ করিতে গেলে ব্যর্থতা অনিবার্য। গত অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত মানবের পক্ষে দেহবিচ্ছুরিত সেই চিরন্তন সৌন্দর্যকে লালসার তাড়নায় নিজস্ব করিতে গেলে-দেহকে বাহুবন্ধনে বাঁধিতে গেলে, তাহার নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। দূর হইতে সেই সৌন্দর্যকে শান্ত-স্নিগ্ধ আনন্দের সঙ্গে অনুভব করিতে হইবে—তাহার রহস্যে বিস্ময়মুগ্ধ হইতে হইবে। দুর্বল মানুষের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। তাহা না হইলে কেবল কামনার অনলেই দগ্ধ হইতে হয়, কোনো সার্থকতাই লাভ হয় না। কবি রূপমোহ বা সৌন্দর্যতৃষ্ণাকে একান্তভাবে দেহকামনাবিচ্যুত করিবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।—

রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস। —(নিষ্ফল প্রয়াস)

শত অন্বেষণ করিলেও সৌন্দর্যকে দেহের মধ্যে পাওয়া যাইবে না।—

নাই নাই—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে -শ্রান্ত করে হিয়া। —(হৃদয়ের ধন)

কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্য উফলব্ধির জন্য কবির একান্ত কামনা এই কবিতাটিতে এবং 'মানসী'র অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সৌন্দর্যকাঙ্ক্ষা বা প্রেমকে কবি অতীন্দ্রিয়লোকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার মূলে আছে একটা Principle of Beauty-র উপলব্ধি। এই Intellectual Beauty-কে শেলি অসীম ও অনন্ত বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। বিহারীলালও সারদাকে চিরন্তনী বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। সকল রোমান্টিক কবিই একটা শ্বাশত ভাবগত ঐক্য কামনা করে। শেলি ও বিহারীলালের প্রেমের আদর্শ ও ভাব-কল্পনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর কিছু পড়িলেও, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানব স্বতন্ত্র। শেলির মতো রবীন্দ্রনাথ Dreamer of dreams নন—আকাশে স্বপ্নরাজ্যে নির্মাণ করিতে সদা ব্যস্ত হন। রবীন্দ্রনাথ বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের মধ্যে

একটা সজ্ঞান ব্যবধান রক্ষা করিয়া কবি—কর্মে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রেম-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে বস্তুজগতের উর্ধ্বে উঠিয়া এক নূতন ভাবজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন এবং প্রেমকে নৈর্ব্যক্তিক, নির্বিশেষে ও চিরন্তন তত্ত্বের উপলব্ধিতে পরিণত করিয়াছেন।

দুইটি পাশ্চাত্য সাহিত্যশিল্পীর সঙ্গে প্রেম-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য আছে। একটি নাট্যকার মেটারলিংক, অপরটি কবি ব্রাউনিং। ব্রাউনিং সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, পরেও করা হইবে। সুবিখ্যাত সাংকেতিক নাট্যকার মরিস মেটারলিংক প্রেমকে আত্মার সৌন্দর্য্যকাঙ্খায় মিলনের কামনা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

তাহার মতে মানবের আত্মা দেহের অতীত এক চিন্ময় সত্তা। প্রেম আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি। প্রেমের মধ্যে তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি। প্রেমের অর্থ এক মানবাত্মার সঙ্গে অন্য মানবাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা। একটি মানবাত্মার অপর মানবাত্মার প্রতি এই যে আকর্ষণ ইহার মূলে আছে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ। আত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধই সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া। সৌন্দর্যই আত্মার কামনার বস্তু, সৌন্দর্যেই তাহার একমাত্র তৃপ্তি। অন্য কোনো দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। এই সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষাই প্রেমের ধারায় প্রবাহিত—উহাই একের প্রতি অন্যের আসক্তির মূল।

'Certain it is that the natural and primitive relationship of soul to soul is a relationship of beauty. For beauty is the only language of our soul; none other is known to it.

(The Inner Beauty : The Treasure of the Humble).

'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ :

প্রেম দুইটি আত্মার মিলন। জড় দেহসংস্কারের পরিমন্ডল হইতে উর্ধ্বগত, কামনা-বাসনার দ্বন্দ্বমুক্ত, দুইটি আত্মার নির্মল, পরম আত্মীয়তা উপলব্ধির মধ্যে যথার্থ প্রেমের অবস্থিতি। সেই দুইটি আত্মার মিলনকে কেবল কেহ সৌন্দর্য ভোগের মধ্যে আবদ্ধ করিলে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। দেহ-সৌন্দর্য আত্মারই অলৌকিক রহস্যময় দীপ্তি রূপায়িত। মানুষ মূলত ভূমার অংশ, সীমার মধ্যে অবাদ্ধ হইলেও তাহার প্রকৃত স্বরূপ সীমাহীন, বৃহৎ ব্যাপ্তির মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণতা তাহার সমগ্রতা। কামনার কলুষলিপ্ত, শত-অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত সংসারের মানুষের পক্ষে সমগ্র মানবকে, আত্মার দেহাশ্রয়ী স্বরূপকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা দূরাশামাত্র। সেই অনন্তের ধনকে পাইতে হইলে অনন্ত প্রেমের প্রয়োজন, তাহা ভীত, কাতর, দুর্বল, ভোগ-কামনায় অন্ধ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের দেহাশ্রিত সৌন্দর্য ব্যক্তি বিশেষের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, সে বিশ্বের আনন্দবর্ধনের জন্য, ভগবানের অভিপ্রায়ের মূর্ত প্রকাশ রূপে পদ্মের মতো স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; দেহের এই সৌন্দর্য বিকাশকে কামনা-বাসনা-তাড়িত হইয়া ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা মূর্খতা। সৌন্দর্যকে দূর হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ও তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রেমের অপূর্ব আনন্দরস পান করা উচিত। এই কামনা কলুষ-বর্জিত প্রেম মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে। দেহাতীত, কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-রসের উপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের উপভোগের প্রতি কবি-হৃদয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু কবি বুঝিতেছেন যে, সৌন্দর্যকে নিতান্ত নিজের করিয়া ভোগ করিতে গেলে তাহার প্রকৃত স্বরূপের আস্বাদ পাওয়া যাইতেছে না-সত্যকার তৃপ্তিও মিলিতেছে না। প্রেমের প্রকৃত অমৃতময় আস্বাদ তিনি পাইতেছেন না—সংকীর্ণ গণ্ডতে আবদ্ধ হওয়ায় প্রেম জ্বালাময় কামে পরিণত হইতেছে। যুবক কবির দুর্নিবার ভোগলালসার আবেগ ও সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার প্রবল ইচ্ছার মধ্যে, এই বাস্তবও আদর্শ প্রেমের মধ্যে, সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে—এই দ্বন্দ্বে কবি-হৃদয়ে যে আনন্দ-বেদনা-আশা-নিরাশা, যে ভাব-চিন্তা উত্থিত হইয়াছে, তাহাই 'মানসী'র অনেক প্রেম-কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। নিস্ফল কামনাতে কবি এই ভোগ প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া যথার্থ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছেন। 'মানসী'র প্রেম-কবিতার মধ্যে এই কবিতাটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

(রবীন্দ্রকাব্য—পরিক্রমা)

মানসীতে প্রকৃতি

ক্ষুদিরাম দাস

মানসীতে প্রকৃতি স্বরূপের অবস্থান করেই কবিকে আকৃষ্ট করেছে দেখতে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলে প্রকৃতির এই স্বরূপাবস্থান নেই। সেখানে প্রকৃতি কবির মিলন বিরহজনিত উচ্ছাসের উদ্বোধনে সহায়ক হয়েছে মাত্র। কৈশোরের রচনা বনফুল ও কবি কাহিনীতে অবশ্য এক প্রকারের প্রকৃতি-প্রীতি বিদ্যমান, কিন্তু তা ওআর্ডস্‌ওআর্থ বা বিহারীলালের অনুকরণসূত্রে গঠিত। মানসীর কয়েকটি কবিতা-আলোচনা করলে দেখা যায় কবির এই প্রকৃতি-প্রীতি সহসা উদিত হয়নি। এর ভাবনামুলে প্রথমে একটা সংশয়বোধ ছিল। এই সংশয় সৃষ্টির সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে। যেমন—

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়। (সিন্ধুতরঙ্গ)

মনে হয় সৃষ্টি যেন বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে (নিষ্ঠুর সৃষ্টি)

অন্ধ সৃষ্টিলীলার একদিকে যে—ধ্বসের মূর্তি ফুটে উঠেছে কবিকে তা ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন করলেও তিনি একমাত্র প্রকৃতি-প্রীতির বশেই এই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, এবং কিছু-পরবর্তী 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় ধ্বংসের উপর প্রেমকেই মৃত্যুঞ্জয়ী সত্য বলে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন—

দিব না দিব না যেতে ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করে বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
..... তবু প্রেম বলে,
সত্য-ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকারলিপি।

মানসীর প্রকৃতি-প্রীতিই কবিকে সৃষ্ট-সম্পর্কিত সংশয়াত্মিকা বৃদ্ধি থেকে পরিত্রাণ করেছে। নিষ্ঠুর সৃষ্টির পরের দিন লেখা জীবন-মধ্যাহ্ন কবিতায় কবি গভীর অনুরাগের সঙ্গে প্রকৃতির উদার মধুর ও গম্ভীর রূপের বর্ণনা দিয়ে পরে স্বকীয় কবিমানসের একটি উল্লেখ্য পরিচয় উদঘাটিত করেছেন—

নিত্যনিশ্বসিত বায়ু উন্মোচিত উষা,
কনকে শ্যামলে সম্মিলন,
দূরদূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস,
ঘনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্য শীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থানে,
আনিতেছে জীবনলহরী।

তখনকার কবিমানসের রসাবস্থা কবি নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছেন—

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ-বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের রক্ষস্থল।
শুধু জেগে ওঠে প্রেম মঙ্গল-মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্র শান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ-মুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন—কুহরে
মঙ্গল-আনন্দ-ধ্বনি বাজে।

বাঙলা সাহিত্যে এই অনাবিল শান্তরসের বর্ণনা দ্বিতীয়রহিত। তা ছাড়া রবীন্দ্রপক্ষে বিশেষ এই যে, রসাবস্থায় তিনি আত্মসমাহিত থাকতে চান না, পৃথিবী ও মানুষকে চান, নিজকে প্রসারিত করে দিতে চান দেশ ও সমাজের জীবনের মধ্যে।

কবির এই প্রথমিক যুগের প্রকৃতি-প্রীতি আরো সহজ ও স্পষ্টভাবে উৎসারিত হয়েছে *'প্রকৃতির-প্রতি'* কবিতায়। শত শত প্রেম-পাশে টানিয়া হৃদয় এ কী খেলা তার থেকে আরম্ভ করে প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে, নাহি দিস্ ধরা এবং যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে মহারূপরাশি; তত বেড়ে যায় প্রেম, যত পাই ব্যথা, যত কাঁদি হাসি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবি তাঁর প্রকৃতি-সম্পর্কিত দুর্নিবার আকর্ষণ আমাদের গোচরে এনেছেন। আদিতে যে-অপরিস্ফুট প্রকৃতি একটি অনির্দেশ্য অপরিণত মনোভাবের পোষাক মাত্র ছিল, বর্তমানে তা স্বরূপে অবস্থান করে কবিকে মুগ্ধ ও বিহ্বল করে তুলেছে। এরপর 'কুহুধ্বনি' কবিতায় পল্লীর সঙ্গে বিজড়িত এই প্রকৃতির মানজীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বর্ণিত হয়েছে—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে,
যেন কোন সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে দরি।...

প্রকৃতি-সম্পর্কিত এই বাসনার বিকাশের মূলে কবিচিত্তের একটি বিশেষ ভাব বা দৃষ্টি প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতিতে ভয়ঙ্করতা ও মাধুর্য, মহান এবং সুন্দর পাশাপাশি থেকেই কবিকে মুগ্ধ করেছে। ঝটিকা, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ধ্বংসের অনিবার্যতায় এবং সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতির দুরধিগম্য ভীষণতার প্রকৃতি নিষ্ঠুর হলেও এর লীলাময় রমণীয় রূপ-যার মধ্যে বিবিধ বর্ণের খেলা, আলোকের সমারোহ, পত্রের শ্যামলিমা ও ফুলফলের বিকাশ থেকে আরম্ভ করে পশুপাখি ও মানুষে প্রাণের ও প্রেমের লীলা প্রকাশিত—তাও অপূর্ব। নিষ্ঠুর জড়ত্বকে অতিক্রম করে প্রাণের স্ফূর্তি জয় ঘোষণা করে চলেছে, এই ভাবই কবিকে ক্রমশ প্রকৃতির দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'সিন্ধুতরঙ্গে' কবিচিত্তের সংশয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথমটির নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে ঐ সংশয় আরো প্রকট—

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব হৃদয়,
খসিয়া পড়িলি, কোন্ নন্দনের তটতরু হতে?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

এই সংশয় থেকে মুক্তির ও প্রীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে উপরি-লিখিত 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায়। কবি তাঁর এই মনোভাবের সঙ্গে স্বভাবতই এ দেশের চিরন্তন মায়াবাদের তুলনা করে দেখেছেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে দ্বৈতের বা বহুত্বের এই ভ্রান্তিকে অতিক্রম করে নয়, একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেই তিনি বেঁচে থাকতে চান।

এইসুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত অনন্তযামিনী।

সোনার-তরীতে যখন কবির প্রকৃতি-প্রীতি সুগভীর বিশ্বাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্থির মর্তপ্রীতি বা মানবানুরাগে পরিণত হয়েছে তখন কবি যে আরও স্পষ্টভাবে মায়াবাদকে অস্বীকার করলেন তা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব। এবং আরও পরবর্তীকালে রুদ্র ও সুন্দরের ধ্বংস ও সৃষ্টির রহস্যময় লীলা-অনুভূতি কেমনভাবে তাঁরা কাব্য-প্রতিভাকে পরিণামের পথে নিয়ে গেছে তখন সেই বিস্ময়কর ইতিহাসও দেখব।

প্রকৃতি সম্পর্কে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র প্রকৃতির কবি ও সাধারণ মানুষের কবি ওয়ার্ডস্ওআর্থ থেকে অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র। ওয়ার্ডসওআর্থের প্রকৃতি-ভাবুকতা প্রকৃতির এই সমগ্রতাবাধ থেকে উদ্দীপ্ত হয়নি, ঐহিকতাবাদী ইউরোপের অকস্মাৎ আগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রে এসেছিল বলে সৃষ্টির নিষ্ঠুর দিক সম্পর্কে ঐ কবি প্রায় অচেতন ছিলেন। আবার রবীন্দ্র-আবির্ভাব-কালে যদিও বাঙালী সমাজে ভোগলিপ্সা, অকর্মণ্যতা, আদর্শচ্যুতি ও নীতিহীনতা সর্বত্র প্রকট হয়ে নবতম নিসর্গ দর্শনের আবির্ভাবের উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি করেছিল, তথাপি, প্রকৃতি ও জীবনকে অবলম্বন করে অরূপাশ্রয়ই ঐ সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির সমাধানরূপে মনীষীদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল—কেবলমাত্র প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ নয়। সম্ভবত ভারতীয় জীবন ও সাধনার বৈশিষ্ট্যই এজন্য দায়ী আর এই সঙ্গে রবীন্দ্রপক্ষে বিরোধ-বৈচিত্র-সমন্বয়ী নব্য-হেগেল সম্প্রদায়ের ভাবদর্শনের স্বজাত্যও অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রোম্যান্টিক ভাবভঙ্গির যে সর্বতোমুখী পরিণাম আমরা দেখতে পাই, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে, উনিশ শতকে প্রারম্ভ বিশ্বের এই নবীন মনোভাব যেন রবীন্দ্রনাথেই পূর্ণতা পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেজন্য প্রকৃতির একদেশানুবর্তী প্রীতি সম্পর্ককে অতিক্রম করে সমগ্র সৃষ্টিগত দ্বান্দ্বিক রহস্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী মতানুরাগ এবং রুদ্র সুন্দরের লীলারস এই কবির কল্পনার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ীভূত হল। ওআর্ডস্ওআর্থ অতি ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যেও যে অর্থ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন তা-ই যেন অধুনা অধিকতর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গৃহীত হয়ে সুনির্দিষ্ট ও চিরন্তন সত্যের রূপ লাভ করলে। নিসর্গের সঙ্গে মানজীবনও একসূত্রে প্রথিত হয়ে পড়ল।

নিসর্গ-প্রীতি সম্পর্কে বর্তমান কবিমানসের এই যে পর্যাকুল অবস্থা, এ কি অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সংবেদনাবস্থা, না এ অনির্বচনীয় আহ্লাদরূপ রসতাপ্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে? বলা বাহুল্য, প্রকৃতিগত কবিতার কাব্যমূল্য সম্পর্কে এই সংশয় উনিশ শতকের পূর্বে দেখা দিলে

অর্থহীন হ'ত না, কিন্তু বর্তমানে তার অবকাশ নেই। নিসর্গপ্রীতিরূপ স্থায়ীভাবে যে যথার্থভাবে রসপর্যায়ভূত হতে পারে তা ওআর্ডস্‌ওআর্থ ও রবীন্দ্রনাথ এবং বিহারীলালও সমভাবে দেখিয়েছেন। 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতার পূর্বোদ্ধৃত অংশটুকুতে যে কবির এই রসাবস্থা বিবৃত হয়েছে তা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এই আনন্দ-অনুভবকে যদি প্রাচীন কোনও রসের পর্যায়ে ফেলতেই হয় তাহলে শান্তরসেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পূর্বেকার উদ্‌ধৃতিতে এই রসেরই অনুভাব ও সঞ্চারীগুলি কবি বিবৃত করেছেন। নিসর্গভাবুকতার শান্তরসপরিণামের ইঙ্গিত কবি চিত্রার 'সুখ' শীর্ষক কবিতাটিতেও দিয়েছেন—

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো,

—ইত্যাদি

কবি ওআর্ডস্‌ওআর্থ তাঁর Prelude কাব্যে নিসর্গ-প্রীতিসঞ্জাত মানসিক অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, আর নিম্নলিখিত বিখ্যাত পংক্তি কয়েকটিতে সংক্ষেপে প্রকৃতি-প্রীতি সম্পর্কে স্বীয় চিত্তের প্রায় সমাহিত যোগাবস্থাই বিবৃত করেছেন—

* * * that blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world
Is lightened—that serene and blessed mood,
In which the affections gently lead us on,—
Until, the breath of this corporeal frame
And ever the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body,and become a living soul—
(Lines composed a few miles above Tintern Abbey)

প্রকৃতি—প্রীতির সঙ্গে বিজড়িত বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে একটি সমগ্র দৃষ্টির পরিচয় অপর কোনো সমকালীন বাঙালী কবির রচনায় পাওয়া যায় না। কী সৌন্দর্য-কল্পনা, কী বিশ্বাত্মবোধ, সবই রবীন্দ্রনাথের একটি কাল্পনিক নিগূঢ় সমগ্রতাবোধ থেকে উৎসারিত। রবীন্দ্র—সমকালীন দেবেন্দ্রনাথ সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির নিসর্গ-প্রীতি বা সৌন্দর্য - স্পৃহা ইউরোপীয় কবিদের মতোই বিশিষ্ট বস্তুর প্রেরণায় ও বিশিষ্ট বিষয় ও ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অপরপক্ষে কল্পনার এই সমগ্র দৃষ্টি থাকার ফলে নিসর্গ প্রীতি থেকে বিশিষ্ট বিশ্বাত্ববোধ, সমাজ জীবনবোধ এবং রূপময় অরূপের লীলার অনুভবের রবীন্দ্র-কবি মানসের উৎক্রান্তি অতি স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে।

(রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়)